দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 APR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

112

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পরীক্ষায় অসদুপায় রোধ করতে হলে--

'সংবাদ' পত্রিকার গত ২১শে চৈত্র (১৩৯৪) সংখ্যায় "পরীক্ষায় অসদুপায় রোধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া হবে" শিরোনামে জনাব আমীর খসরুর প্রতিবেদনটি বিশেষ আগ্রহের সাথে পড়লাম। এই অসদুপায় হতে পরিত্রাণকল্পে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যে নিতেই হবে এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কারণ সুদীর্ঘ উনিশ বছরের সবেগে সংক্রামিত রোগের হঠাৎ করে উপশম কেউই-আশা করেনা। এ শুভ প্রচেষ্টায় যথাশীঘ্র আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক--এটাই মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু কথা হলো রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার আগে রোগের সার্বিক লক্ষণাদি, কারণ ইত্যাদি সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন--সেই বিবেচনায়ই প্রতিবেদনের বক্তব্যে সম্পূরক হিসেবে দুটি কথা উল্লেখ করছি।

ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রায় সবকটি স্কুলেই শিক্ষকগণ হাজিরা দেন বটে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যথোপযুক্তভাবে শিক্ষা দানের প্রতি তাঁদের নজর আছে বলে মনে হবে না। পক্ষান্তরে অনেক শিক্ষকই তাদের আবাস ঘরগুলোকে প্রাইভেট ক্লাসের নামে প্রাইভেট স্কুলে পরিণত করেছেন; ফলে ঘন্টায় ঘণ্টায় আট/দশজন করে ছাত্র-ছাত্রী আসছে এবং যাচ্ছে। বিনিময়ে এই শিক্ষক মহোদয়গণ প্রতি মাসে জনপ্রতি ৮/১০ হাজার টাকা আয়ের দোকান খুলে বসেছেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তিবশতঃ স্কুলে পাঠদানের উদ্যম তাঁদের থাকে না। স্কুলের সময় তাঁরা বস্তুতপক্ষে বিশ্রামই গ্রহণ করেন এবং অপরপক্ষে তাঁদের ব্যক্তিগত স্কুলের ছাত্র জোগাড়ের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।

প্রশ্নপত্রে ভুলের ব্যাপারে শুধু এস,এস,সি নয়; নিচের শ্রেণীর প্রত্যেকটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও যথেষ্ট ভুল পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি ছাত্রের কাছ হতেই বর্ধিত হারে পরীক্ষার ফি নেয়া হলেও কোন স্কুলের শিক্ষককেই প্রশ্নপত্র তৈরির পরিশ্রম করতে হয় না। কারণ থানা-শিক্ষক সমিতি হাজার হাজার কপি প্রশ্নপত্র ছেপে রাখেন আর স্কুলগুলো পাইকারী দামে তা ক্রয় করে। এতে করে তাঁদের বেশ দু'পয়সা আয়ের ব্যবস্থা হয় এবং পরিশ্রমেরও যথেষ্ট সাশ্রয় হয়। কাজেই অপঠিত এবং বই বহির্ভূত প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয় স্বাভাবিক কারণেই।

বাস্তবিকপক্ষে প্রায় প্রতিটি স্কুলই এখন এক একটি লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে; আর অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকতাও একটি চমৎকার লাভজনক বাণিজ্যিক পেশায় হয়েছে রূপান্তরিত। শিক্ষকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত স্কুলের ছাত্রদেরকে সাজেশনের নামে প্রশ্নপত্র প্রদান করতঃ তাঁদের স্কুলের বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর থাকেন। এ ধরনের স্কুল শিক্ষকদের আজ আর বেতনের তেমন প্রয়োজন নেই। চাকরি থাকলেই যথেষ্ট। ডাক্তারদের ব্যক্তিগত হাসপাতালের মত যত্রতত্র প্রাইভেট স্কুল গড়ে উঠছে যার প্রচার প্রতিদিনের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে।

প্রসঙ্গত স্কুল পরিদর্শকের বিষয় এসে যায়। সর্বত্রই পরিদর্শক আছেন। কিন্তু অভিযোগ আছে, শিক্ষকদের কাছ হতে দর্শনি গ্রহণপূর্বক অনেকে ঘরে বসেই তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আরো অভিযোগ আছে যে, স্কুল যত বেশী তাদের খুশি করতে পারে সে স্কুলের রিপোর্ট তত বেশী ভাল দেয়া হয়। সমস্ত দুর্ভাগ্যের স্বীকার হতে হচ্ছে হতভাগা ছাত্রছাত্রী এবং অসহায় অভিভাবকবৃন্দকেই।

এরপর আসে পরীক্ষা উপলক্ষে অন্যবিধ আয়; যেমন-- স্কুলের সাময়িক পরীক্ষায়ও ইদানীং প্রবেশপত্রদানের রেওয়াজ চলছে। একটি সাদা কাগজের টুকরায় স্কুলের একটি সিল প্রদান করতঃ তাকেই প্রবেশপত্র বলা হয়। আমার মনে হয় পরীক্ষায় প্রবেশপত্র পরিচিতি নির্ণয়কল্পেই প্রচলন করা হয়েছে। একই কেন্দ্রে কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিলে তাদের পরিচিতির প্রশ্ন অবশ্যই আসে আর তাই তার প্রচলন। কিন্তু যে ছাত্র নিজের স্কুলে বসে তার বার্ষিক ষান্মাসিক পরীক্ষা দিচ্ছে তার কোন প্রকার পরিচিতির অবকাশ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। অথচ এই পরিচিতির প্রহসনের জন্য প্রতিটি ছাত্রকে দুই থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ফি দিতে হয়। এতে করে স্কুলের শিক্ষকদের হিসাব বহির্ভূতভাবেই বেশ দু পয়সার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

তার পর আসে এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষার কেন্দ্র তথা স্কুল বদলের কথা। কোন কোন স্কুল নির্বাচনী পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি তথা নির্বাচন [illegible] করে। আর তা করতে গিয়ে প্রতিটি ছাত্রের কাছ হতে তিন হাজার বা তদূর্ধ্ব টাকা আদায় করে। পুনরায় আসে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার পালা। আজকাল প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা প্রায় প্রতি গ্রুপেই প্রচলিত হয়েছে। এই পরীক্ষার খাতায় সই করানোর জন্য ছাত্রদেরকে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট যেতে হয়। আর তখন প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে এক বিষয়ের জন্য ২/৩ শত টাকা প্রদান করতে হয়। যদিও এ বিষয়টির নিয়ম হলো প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট নিয়মে ছাত্র-ছাত্রীকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো এবং তাদের হাতে কলমে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রমাণস্বরূপ নির্দিষ্ট খাতায় তা লিপিবদ্ধ করা এবং যথারীতি নিরীক্ষনান্তে এতে শিক্ষক মহোদয়দের সই ছাপ প্রদান করা। এ নির্ধারিত নিয়ম আজ সর্বত্রই লংঘিত ও উপেক্ষিত হয়ে চলছে।

এতদ্ভিন্ন রসিদ চার্জ, মেরিট বুক চার্জ ইত্যাদি কত প্রকারের চার্জ যে দিতে হয় তা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকই জ্ঞাত।

তারপর পোশাক, মনোগ্রাম ইত্যাদি খাতও কম নয়। এর কোনটিরই প্রয়োজন নেই তা আমি বলছি না কিন্তু ২০% ভাগ প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ৮০% ভাগ অপ্রয়োজনকে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে না তো!

আজ তাই অভিভাবকদের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। এর থেকেও সম্যক নিস্কৃতি প্রয়োজন।

তাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন দূর করতে হলে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্র হতেই দুর্নীতি-অব্যবস্থা দূর করা দরকার।

এম, এ হোছাইন ভুঞা,
১৭/১/৪ বি ব্লক
হালিশহর কলোনী, চট্টগ্রাম।

শিক্ষকদের সমস্যা

জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি হয় না কেন? টাইমস্কেলের বেলায় এফেকটিভ সার্ভিস ধরা হয় না কেন? বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের যদি পূর্ণ চাকুরীকাল ধরে সরকারী স্কেল অনুসারে সরকার ৭০% বেতন প্রদান করতে পারে তবে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের বেলায় পূর্ণ চাকুরীকাল ধরে পদোন্নতি ও টাইমস্কেল প্রদান করা হয় না কেন? পি,এস,সি পাস কলেজ শিক্ষক আর জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নিয়মনীতি কেন? উল্লেখিত প্রশ্নের সমাধান না পেয়ে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকরা পদোন্নতি ও টাইম স্কেলের বেলায় অমানবিক অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষোভে দুঃখে হতাশার মধ্যে চাকুরী করছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অধিদপ্তর একেবারেই নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও মাথাব্যথা নেই। অতএব মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উল্লেখিত সমস্যার অতি শিগগিরই সমাধানের জন্যে সদয়দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আজিজুল হক,
প্রভাষক, সরকারী মওলানা
মোহাম্মদ আলী কলেজ,
টাঙ্গাইল।